‘আমার চেয়ে ভালো অনেক শিল্পী আসতে পারে কিন্তু আমার জায়গা কেউ নিতে পারবে না’

i“bv jvqjv

i“bv jvqjv| Rxeš wKse`šx| cvq 40 eQi a‡i MvB‡Qb| Rbwcqvq †Kv‡bv NvUwZ †bB| †Q‡j-e‡ov mevi Kv‡Q cvq mgvb Rbwcq| ïa G‡`k bq| Dcgnv‡`‡kI i‡q‡Q Zvi mgvb Rbwcqv| bvbv †`‡k, bvbv fvlvq Mvb †M‡q †c‡q‡Qb AvšRwZK ¯xKwZ| Amvgvb¨ GB wkíxi `xN mv¶vrKv‡i D‡V G‡m‡Q Zvi msMxZ I e¨w³ Rxe‡bi A‡bK Rvbv-ARvbv NUbv| mv¶vrKvi wb‡q‡Qb Awid Lvb

সাপ্তাহিক ২০০০ : বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যে কাজটা করে আপনি নিজে প্রশংসিত হয়েছেন এবং আরও কিছু শিল্পীকে এর সঙ্গে জড়িত করে প্রশংসার ভাগিদার করেছেন এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার শুরু কিভাবে হলো?

রুনা লায়লা : অনেক বছর ধরেই আমি বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি প্রোগ্রাম করছি। এর আগে ১৯৭৭ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢাকা শিশু হাসপাতালে বড় বোন দিনা

লায়লার নামে একটা ওয়ার্ড করে দিয়েছি। এছাড়াও দেশ-বিদেশে নানা চ্যারিটিতে অংশ নিয়েছি ক্যান্সার হাসপাতাল, নির্মাণ বা, এইডসের জন্য। ঢাকার রমনায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ইনস্টিটিউশন আছে। সেখানকার বোর্ড মেম্বাররা ফোন করে দেখা করতে এলেন। তাদের প্রস্তাব ছিল, আমি যেন একটা অনুষ্ঠান করে কিছু ফান্ড তুলে দিই স্কুলটার জন্য। আমি তাদের ডকুমেন্টস দেখলাম। তারা কি কি কাজ এ পর্যন্ত করেছেন তা দেখলাম। বললাম, আগে আমি স্কুলটা দেখে নিই, কি ধরনের কাজ করছেন, কি রকম দরকার, কি নেই। কি করা যেতে পারে। তারপর ডিসিশন জানাবো।

আমি স্কুলটাতে গেলাম। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করলাম, বিভিন্ন ক্লাস ঘুরে দেখলাম। ওদের দেখে আমি চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল, আমরা কত লাকি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক ভাবেই জন্ম নিয়েছে। সেখানে এ বাচ্চাদের কষ্টটা সারা জীবনের। বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের, বাবা-মায়েরও কষ্ট। কিছু কিছু বাচ্চা যারা নিজের

আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই আমাদের সিদ্ধান্ত খুশি মনে নিয়েছে। আমার মেয়ে আলমগীর সাহেবের ছেলেমেয়ে কাউকেই আমরা আলাদা করে দেখি না। সবাই আমরা এক পরিবারের সদস্য

ফিলিংসগুলো একেবারেই বোঝাতে পারছে না। তাদের সঙ্গে মায়েরাও স্কুলে থাকে। এসব দেখে বেশ মন খারাপ ছিল। বাড়ি ফিরে আলমগীর সাহেবকে ঘটনাগুলো বললাম। তখন চিন্তা করলাম, এদের জন্য একটা কিছু করবো। কিন্তু একা না করে আরও বড় আকারে আরও কিছু শিল্পীদের নিয়ে করলে ভালো হয়। আমি মনে করি, সবারই এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমাদের শিল্পীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য অনেক চ্যারিটি প্রোগ্রাম তারা করছে। বাইরে কিছু লোকের ধারণা আছে শিল্পীরা টাকা ছাড়া কোনো কাজ করে না। ভালো কাজে এগিয়ে আসে না। এটা যে কত বড় মিথ্যে প্রচার তা এ অনুষ্ঠানটা প্রমাণ করল। আলমগীর সাহেবকে বলার পর উনি বললেন, তাহলে আমরা সবাই মিলে একটা উদ্যোগ নিই। তুমি কিছু ক্যান্ট্রাক্ট কর, কিছু শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ কর এবং আমিও কিছু করি। ভালো লেগেছে, যাদের সঙ্গেই এ নিয়ে কথা বলেছি তারা এক কথায় রাজি হয়েছেন। ফিল্ম, নাচ, গান, টেলিভিশন, স্টেজ সব ক্ষেত্রের সবাই বলল যে আমরা আছি। এরপর আমরা যখন এনাউন্সমেন্ট করলাম তখন অনেক শিল্পী নিজে থেকেই যোগাযোগ করেছে যে তারাও এতে অংশ নিতে চান। এটা এতো ভালো লেগেছে যে, সবাই এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে কিন্তু কেউ কোনো টাকা নেয়নি। অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে এসে প্রোগ্রাম করেছে। কেউ টিকিট সেল করেছে, কেউ ডোনেশন জোগাড় করেছে। আমার মনে হয়েছে কাজটি আমরা একটি পরিবারের মতো করেছি। বিভিন্ন স্পন্সরের সঙ্গে ফান্ডের ব্যাপারে কথা বলেছি। তারা সাড়া দিয়েছেন।

অনেক পত্রিকা বিনামূল্যে অ্যাড দিয়েছে এ প্রোগ্রামের। এটা বিরাট ব্যাপার। এতে টাকা সেভ হয়েছে, তা আমরা ফান্ডে দিতে পেরেছি। বিভিন্ন চ্যানেলও হেল্প করেছে নানা দিক থেকে। এনটিভি তো আমাদের নিজেদের পার্টনার। ওরা বলেছে প্রোগ্রাম প্রচারের সময় যে স্পন্সর পাওয়া যাবে তা এ ফান্ডের জন্য ব্যয় হবে। এরকমভাবে প্রত্যেকে যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি যে কতটা আনন্দিত তা বলতে পারব না। আমি এতটা এক্সপেক্ট করিনি। সত্যি অর্থে এত বেশি সাড়া পাব, পাবলিকের কাছ থেকে এটাও আশা করিনি। অনেকেই ফোন করে পারসোনাল ডোনেশনও করেছেন। ৫০০০, ১০০০০ যে যেমন পেরেছেন অনুষ্ঠানের আগে দিয়েছেন, অনুষ্ঠানের সময় দিয়েছেন এবং এখনো অনেকে দিচ্ছেন। এছাড়া কিছু ডোনার এজেন্সির সঙ্গে কথা হয়েছে। তারাও কিছু কিছু হেল্প করেছে। নিজেরা দেখেও এসেছে। আরও সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। আমার মনে হয় যে আমরা একটা স্টেপ নিয়েছি। এটাকে আরও বড় করে, কিছু শিল্পী যারা আছেন, তাদের সঙ্গে আরও কিছু শিল্পী আমরা আহ্বান করব। আমরা চাই যত বেশি শিল্পী, যত বেশি পারটিসিপেন্ট থাকে ততই ভালো। কিন্তু সময়স্বল্পতার কারণে হয়ত তা সম্ভব হয় না, যে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করব। এ ছাড়া আমরা চিন্তা করেছি যাদের সত্যিকারের অর্থের প্রয়োজন আছে তাদের জন্য প্রোগ্রাম করব, পুরো টাকা ফান্ডে দেব। এই প্রোগ্রামটার পেছনে আমি সেই মার্চ মাস থেকে লেগে ছিলাম। বিভিন্ন জনকে ফোন করেছি ডোনেশনের জন্য, পারটিসিপিশনের জন্য। আমরা আগে এ ধরনের প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি, তবে এবার পুরো প্রোগ্রামটা আমাদের দায়িত্ব ছিল। টিকিটের দাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে পুরো প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছি। আল্লাহর রহমতে প্রোগ্রামটা খুব সাকসেসফুল হয়েছে। আপনারা খুব হেল্প করেছেন। মিডিয়া প্রেস প্রত্যেকে সেখানে এগিয়ে এসেছে। অতটা আমি এক্সপেক্ট করিনি। আমি খুব আনন্দিত এধরনের কাজে এত সাড়া পেয়েছি বলে। ভবিষ্যতে যদি আমরা এ ধরনের প্রোগ্রাম করি তবে আশানুরূপ সাড়া পাব।

২০০০ : অনেক দিন থেকেই আপনি এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের স্বনামধন্য একজন শিল্পী হিসেবে আপনি এর আগে এমন উদ্যোগ নিয়ে তাদের ডাকলেই তো ব্যাপক সাড়া পেতেন।

রুনা লায়লা : আগে যেগুলো করেছি তা ব্যক্তিগতভাবে করেছি। এ ধরনের প্রোগ্রামে কেউ ডাকলে গান করে এসেছি। ঢাকা শিশু হাসপাতাল অবশ্য আমি নিজের উদ্যোগে করেছি। আরও দেশী বিদেশী সংস্থার চ্যারিটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। এভাবেই চিন্তা করলাম এ ধরনের কাজ আরও বড় আকারে যদি করতে পারি তাহলে অনেক শিল্পী এবং অনেকেরই হেল্প আমাদের লাগবে ভালোভাবে করার জন্য, সে হিসেবে এটা করা।

২০০০ : এ রকম আরও কোনো কিছু কি আপনাকে অ্যাফেক্ট করে...?

রুনা লায়লা : এ রকম আরও অনেক কিছু যেমন ক্যানসার রিসার্চের তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। নতুন নতুন অনেক টেকনোলজি আসছে যা আমাদের দেশে এভেলেবল না। অনেক পেশেন্ট আছে যাদের ক্ষমতা থাকে না ভালো চিকিৎসা করার। যারা গরিব প্রয়োজনীয় টাকা থাকে না, তাদের জন্য কিছু করা যায়। আরও আছে যে অনেক বাচ্চাকেই রাস্তায় দেখা যায়। এখন অনেকেই কিছু বিক্রি করে আয় করছে। তাও ভালো, ভিক্ষা করছে না। এদের জন্য কিছু করা যেতে পারে। যেমন থাকার জায়গা হলো, পড়াশোনার সুযোগ হলো, অন্য বাচ্চাদের মতো খেলার সুযোগ পেল, একটা সিস্টেম হলো নরমাল বাচ্চাদের মতো। কোনো বাসায় হয়ত কাজ করছে, ফিজিক্যাল লেবার দিচ্ছে, সে সময়টা সে পড়াশোনা করতে পারে। বা অন্য কোনো কাজে বিশেষ ট্যালেন্ট থাকতে পারে, যা এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। এরকম অনেক সুযোগ আছে।

প্রথম থেকে বাচ্চারা যে বিষয়গুলোতে ইনভলবড আছে সেখানে কাজ করার ইচ্ছে বেশি। আসলে বাচ্চাদের সঙ্গে যেকোনো কাজ করতে আনন্দ পাই। বাচ্চাদের জন্য কিছু করতে পারা আমার জীবনের একটা বিরাট পাওয়া হবে।

২০০০ : এবার আপনার গান নিয়ে কথা বলি। আপনার মা, বোন গাইতেন, তাদের গান গাওয়াটাই কি গানে আপনাকে প্রভাবিত করেছে?

রুনা লায়লা : তা তো অবশ্যই। মা গান করতেন, বোন দিনা লায়লা গান শিখতেন, বাসায় নিয়মিত গানের চর্চা ছিল, ওস্তাদ আসতেন গান শেখাতে। তবে নাচের দিকে আমার ঝোঁক ছিল বেশি। নাচ শিখেছি ৪ বছর ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকে। বিভিন্ন ধরনের নাচ শিখেছি। কিন্তু পরিবেশের কারণে গানের দিকে ঝুঁকেছি। প্রথমে এতটা কখনো চিন্তাও করিনি। তখন তো বাইরে এসে গান করাটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। ভালো ঘরের ছেলেমেয়েরা আসতে চাইত না, পরিবার থেকে দেয়াও হত

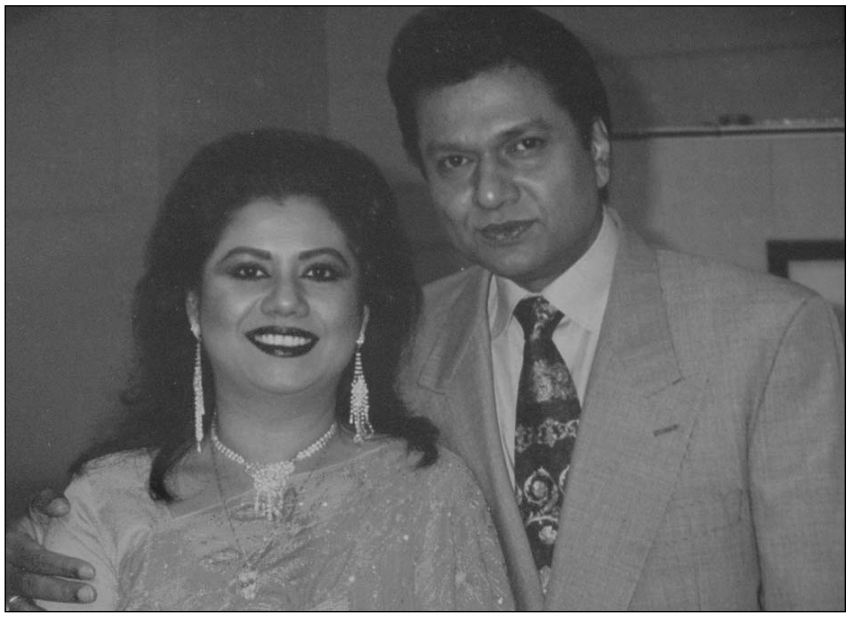

আলমগীর সাহেবের ক্ষেত্রে দেখেছি তিনি বেশ প্রাউডলি বলেন, আমার স্ত্রী একজন নামকরা শিল্পী

না স্টেজে যাওয়া বা ফিল্মে যাওয়া। আসলে তখন ব্যাপারটা ছিল শখ করে গান-নাচ শেখা। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে গান শেখানো হয়। এ লাইনে আসা হঠাৎ করে ।

২০০০ : গানটা শিখেছেন মূলত কার কাছে?

রুনা লায়লা : ওস্তাদ ছিলেন প্রথমে আব্দুল কাদের প্লিয়ারাংকও । গজল শিখেছি ভাজন সম্রাট গোলাম আলীর বড় ভাই পন্ডিত গোলাম কাদেরের কাছে।

২০০০: প্রথম পাবলিক প্লেসে কবে গাইলেন?

রুনা লায়লা : আমার বয়স যখন ৬ বছর তখন আমি স্টেজে প্রথম গান করি। সেটাও মজার ঘটনা। আমার বোনের গাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ তার গলার সমস্যা হওয়ায় আমাকে দিয়ে গাওয়ানা হলো। ২০০০-কি ধরনের গান প্রথমে গাইতেন।

রুনা লায়লা : মূলত ক্ল্যাসিক্যাল শিখেছি। তাই আমার মনে হয় অন্য সব ধরনের গান গাওয়াটা ইজি হয়ে যায় আমার জন্য।

২০০০: আমরা যে রুনা লায়লাকে পেয়েছি তিনি কি শুধুই গড গিফটেড, নাকি নিজস্ব চর্চার ব্যাপকতা ছিল।

রুনা লায়লা : গড গিফটেড তো থাকতেই হবে, গলায় সুর না থাকলে তো সুরে আনা যাবে না। অনেকটাই থাকতে হবে। সেটাকে প্রপারলি চ্যানেলাইজ করে প্রপার ট্রেনিং দেয়াটা বা পাওয়াটা একটা বিরাট ব্যাপার। এমন অনেকেই আছে যারা সুযোগের অভাবে, সঠিক শিক্ষার অভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারছেন না। আমি হয়ত প্রপার ট্রেনিং পেয়েছিলাম। তাই আমাকে তুলে ধরতে পেরেছি। আমার এ প্রতিষ্ঠায় আমার মায়ের অনেক অবদান রয়েছে। মা যখন দেখলেন আমার ভেতরে মেধা আছে তিনি আমাকে সাপোর্ট দিলেন। অবশ্য বাবাও এক্ষেত্রে সাপোর্ট করেছিলেন। তখন ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েরা এ লাইনে আসুক তা কেউ চাইত না। গার্জিয়ানদের দিক থেকে অনেক সময় দেখা যেত বাবারা না হয় মা কেউ না কেউ না বাধা দিতেন। আবার দু'জনেই বা একজন সাপোর্ট করতে। এক্ষেত্রে যখন ফিল্মে গানের অফার আসতে থাকে তখন বাবা-মা দু'জনেই হেজিটেড ফিল করছিলেন ফিল্মে গান গাওয়ার ব্যাপারে। ওনাদের আপত্তির কারণ ছিল ফিল্মের পরিবেশ তো ভালো নয়। একটা ধারণা ছিল ফিল্মে সব খারাপ লোক থাকে। এটা তো সত্যি না, সব প্রফেশনেই ভালোমন্দ মিলিয়েই থাকে। বাবা মা কিছুটা ইনডিসিশনে ছিলেন। স্টেজে গান করবে আত্মীয় স্বজন কি বলবে পরে যখন কনভিন্সড হলো, তখন দেখল আপত্তি করার তো কিছু নেই। তখন প্রথম আমি সে গান করলাম। সেটা একটা বাচ্চার কণ্ঠে ছিল। ছবির নাম জ্যানু তারপরের গান সব হিরোইনদের। প্রথম গানটির গায়িখা ছিলেন শর্মিলী আহমেদ আসলে আমার ইচ্ছে ছিল ফিল্মের গান করার। বাবা-মা বলেছিলেন ঠিক আছে একটা গান করুক তারপর আর নয়। এদিকে প্রচুর অফার আসতে থাকল- সব হিরোইনের গান। তখন আমার বয়স সাড়ে এগারো কি বার বছর। ঠিকমত তখন গানের অর্থও বুঝতে পারতাম না। আমাকে গানের কথা মিউজিক ডিরেক্টর এবং রাইটার বোঝাতেন। এভাবে আস্তে আস্তে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যদি নিজেরা ঠিক থাকি তবে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

২০০০ : প্রথম দিকে গাওয়া আপনার গানগুলোর কথা বলুন।

রুনা লায়লা : করাচিতে আমি শুরু করেছি